সাফল্যের চাবিকাঠি

কোয়ান্টাম মেথড

মহাজাতক

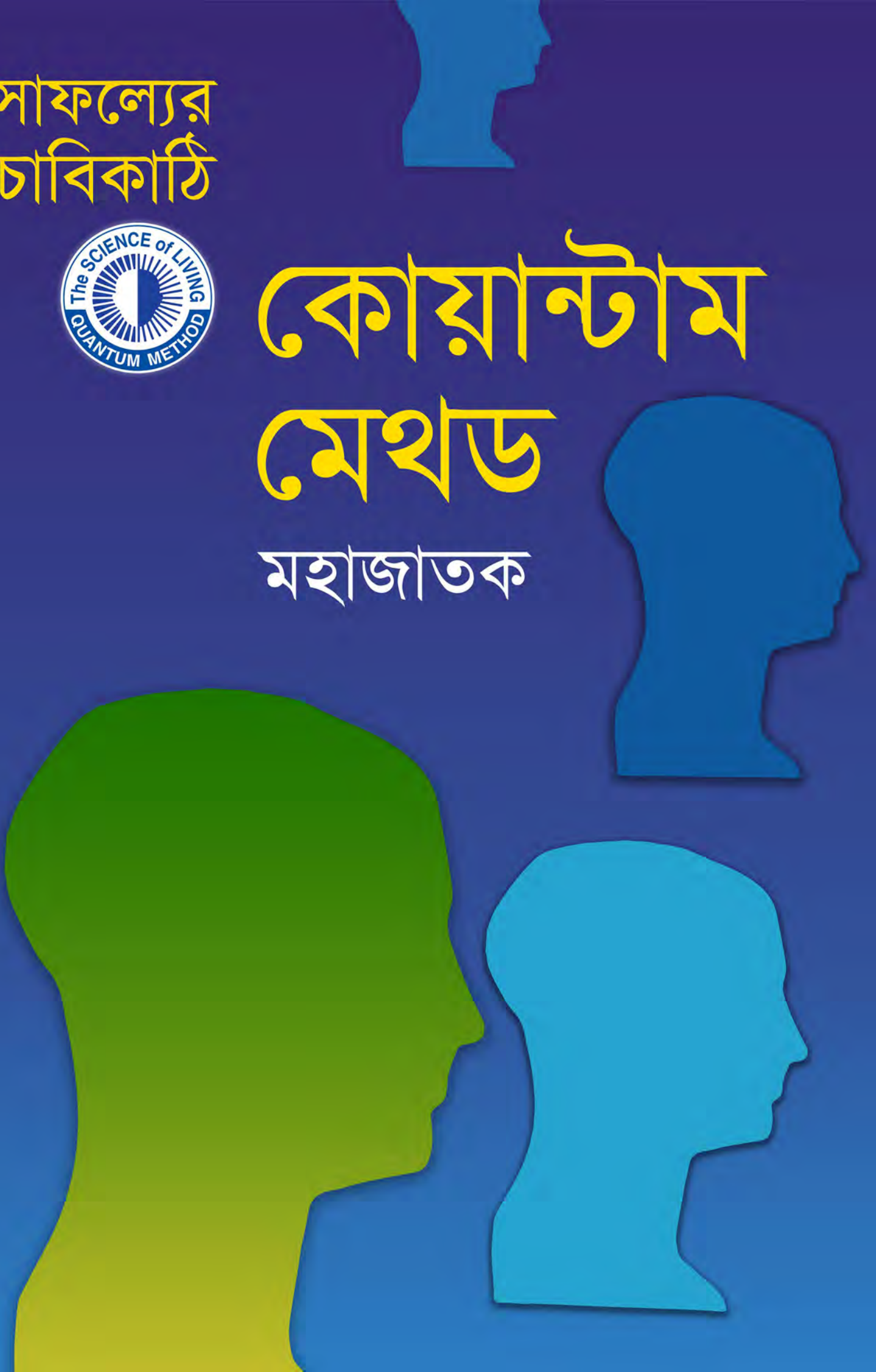

সাফল্যের চাবিকাঠি

কোয়ান্টাম মেথড

মহাজাতক

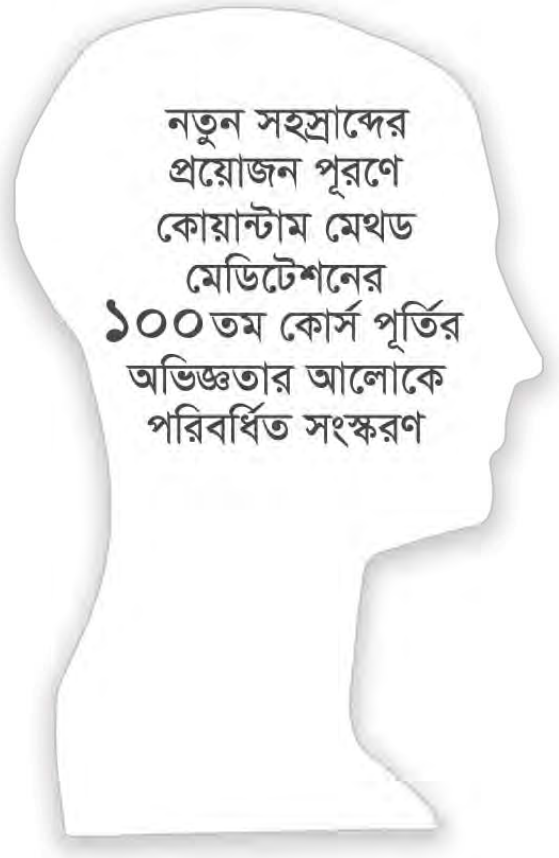

প্রজাপতি প্রকাশন

শ্রদ্ধেয় গুরু প্রফেসর এম ইউ আহমেদ

যিনি প্রথম আশ্রম ও খানকার

চৌহদ্দি থেকে বের করে ধ্যানকে গণমানুষের

আত্ম উন্নয়ন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে প্রয়োগ

করেছেন

ও

মহাজাগতিক সফরসঙ্গী নাহার-কে

যার এক যুগের স্বপ্ন, ত্যাগ ও

অনুপ্রেরণার ফসল এ বই

সূচিপত্র

মেডিটেশন : শৃঙ্খল মুক্তির পথ -৫
যাত্রা হোক শুরু -৯
নতুন বিশ্বদৃষ্টি -১১
১. মন : শক্তি রহস্য -১৫
২. চাবিকাঠি : বিশ্বাস -২০
৩. ব্রেন : বিস্ময়কর জৈব কম্পিউটার -২৬
৪. নেপথ্যনায়ক -৪৭
৫. ধ্যানাবস্থা : প্রথম পদক্ষেপ -৬১
৬. শিথিলায়ন : মনের বাড়ি -৬৮
৭. আত্মবিনাশী প্রোগ্রাম - ১ : মনের বিষ -৮১
৮. আত্মবিনাশী প্রোগ্রাম - ২ : মনের বাঘ -৯৪
৯. আত্মবিকাশী প্রোগ্রাম - ১ : অটোসাজেশন ও প্রত্যয়ন -১১১
১০. আত্মবিকাশী প্রোগ্রাম - ২ : মনছবি -১২৭
১১. কল্পনা : মনের চালিকা শক্তি -১৪৩
১২. মনোযোগ : মনের বল -১৫২
১৩. মনে রাখার কৌশল -১৬৩
১৪. কোয়ান্টা সংকেত -১৭৭
১৫. জাগৃতি ও ঘুম -১৮৬
১৬. স্বপ্ন : সৃজনশীল প্রয়োগ -১৯৩
১৭. ছাত্র জীবনে সাফল্য লাভ -১৯৭
১৮. কোয়ান্টাম নিরাময় -২০৪
১৯. মেদ ভুঁড়ি : ওজন নিয়ন্ত্রন -২২৭
২০. ধূমপান ও ড্রাগ বর্জন -২৩১
২১. সুস্বাস্থ্যের কোয়ান্টাম ভিত্তি -২৩৫
২২. নতুন জীবনের পথে -২৩৯
অতিচেতনার পথে -২৪৩
২৩. ডান ও বাম বলয়ের সমন্বয় -২৪৪
২৪. প্রকৃতির সাথে একাত্ম হোন -২৫১
২৫. কমান্ড সেন্টার : কল্যাণ প্রক্রিয়া -২৫৭
২৬. অন্তর্গুরু -২৭২
২৭. প্রজ্ঞা -২৭৬
হে অনন্য মানুষ ! আপনাকে অভিনন্দন -২৮২

মেডিটেশন : শৃঙ্খল মুক্তির পথ

মানুষের অসীম শক্তি ও সম্ভাবনাকে সবসময় শৃঙ্খলিত ও পঙ্গু করে রাখে সংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাস। অনন্ত সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে প্রচলিত ধারণার শৃঙ্খলে সে ক্রমান্বয়ে বন্দি হয়ে পড়ে। পরিবেশ যা তাকে ভাবতে শেখায় সে তা-ই ভাবে, যা করতে বলে তা-ই করে। যে হতে পারত যুগস্রষ্টা বিজ্ঞানী, হতে পারত শতাব্দীর অভিযাত্রী, অমর কথাশিল্পী, হতে পারত মহান নেতা বা বিপ্লবী, হতে পারত আত্মজয়ী বীর বা ধর্মবেত্তা, সেই মানবশিশুই ভ্রান্ত ধারণার বন্দি হয়ে পরিণত হচ্ছে কর্মবিমুখ, হতাশ, ব্যর্থ কাপুরুষে। এ ব্যর্থতার কারণ মেধা বা সামর্থ্যের অভাব নয়, এ ব্যর্থতার কারণ বস্তুগত জিঞ্জির নয়, এ ব্যর্থতার কারণ মনোজাগতিক শিকল।

প্রতিটি মানবশিশু সুপ্ত মহামানবরূপে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু কায়েমি স্বার্থ সৃষ্ট মনোজাগতিক জিঞ্জির বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধীরে ধীরে তাকে পরিণত করে এক অসহায় নিরুপায় প্রাণিতে। সার্কাসের হাতির জীবনের দিকে তাকালে এই মনোজাগতিক দাসত্বের বিষয়টি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না।

জঙ্গল থেকে দুরন্ত প্রাণচঞ্চল হস্তি শাবককে ধরে এনে ছয় ফুট লোহার শিকল দিয়ে শক্ত পাটাতনের সাথে বেঁধে রাখা হয়। প্রথমদিকে হস্তিশিশু শিকল ছেঁড়ার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালায়। কিন্তু এত ছোট শরীর দিয়ে সে জিঞ্জির ভাঙতে পারে না। উল্টো তার পা-ই রক্তাক্ত হয়ে যায়। ফলে একসময় এই গণ্ডি ও বন্দিত্বের কাছে হস্তি শিশু আত্মসমর্পণ করে। এভাবে তার মধ্যে তৈরি হয় সংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাস। সে বিশ্বাস করতে শুরু করে এই গণ্ডি, এই জিঞ্জির থেকে তার মুক্তি নেই। এটাই তার নিয়তি।

হস্তিশিশু বিশালদেহী পূর্ণাঙ্গ হাতিতে পরিণত হওয়ার পরও শিকল দিয়ে তাকে ছাগল বাঁধার খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলেও সে ছয় ফুট বৃত্তকেই তার পৃথিবী ধরে নেয়। যখনই শিকলে টান পড়ে তখনই সে তার বৃত্তের আরো ভেতরে প্রবেশ করে। ভ্রান্ত বিশ্বাস তাকে বলে এর চেয়ে আর এগুনোর সাধ্য তোমার নেই। এমনকি দেখা গেছে, সার্কাস মেলায় আগুন লাগলেও হাতি তার শিকল ভেঙে পালানোর চেষ্টা করে না। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কারণ ভ্রান্ত বিশ্বাস তাকে সেখানেই দাঁড় করিয়ে রাখে। যখন তার দেহের শক্তি দিয়ে এক টানে খুঁটিসহ সবকিছু উপড়ে ফেলতে পারে, তখনো সে ভাবে এই ছয় ফুট বৃত্তই আমার নিয়তি। তার এই শৃঙ্খল লোহার শিকলের নয়, খুঁটির নয়। এ শৃঙ্খল হচ্ছে মনের। আমাদের অবস্থাও এখন তা-ই। আমাদের প্রতিটি মানুষের প্রতিটি পরিবারের পুরো জাতির বিপুল সম্ভাবনা, শক্তি ও সামর্থ থাকা সত্ত্বেও সংস্কার, ভ্রান্ত বিশ্বাস, শোষক ও পরাভববাদীদের আরোপিত মিথ্যা ধারণার শৃঙ্খলে আমরা নিজেদেরকে গণ্ডিবদ্ধ ও বন্দি করে ফেলেছি। দুর্দশাগ্রস্ত ও গ্লানিকর জীবনকেই আমরা আমাদের নিয়তি ও ভাগ্যরূপে মেনে নিচ্ছি। সার্কাসের হাতির মতোই পুড়ে মরে গেলেও শিকল ভাঙার কোনো চেষ্টা করছি না। কিন্তু শুধুমাত্র একবার এই সংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা ঝেড়ে ফেলে দিলে দেখতে পাব আমরা প্রত্যেকে এক বিপুল

শক্তির আধার।

এই ভ্রান্ত ধারণার শিকল ভেঙে মুক্ত বিশ্বাসে উপনীত হওয়াটাই হচ্ছে মানুষের আসল স্বাধীনতা। কারণ মুক্ত বিশ্বাস হচ্ছে সকল সাফল্য, সকল অর্জনের ভিত্তি। বিশ্বাসই রোগ নিরাময় করে, ব্যর্থতাকে সাফল্যে আর অশান্তিকে প্রশান্তিতে রূপান্তরিত করে। বিশ্বাসই মেধাকে বিকশিত করে, যোগ্যতাকে কাজে লাগায়, দক্ষতা সৃষ্টি করে।

মুক্ত বিশ্বাস থেকেই শুরু হয় মানুষের মানবিকতার উত্থান পর্ব। তখনই সে বুঝতে পারে, সে সৃষ্টির সেরা, আশরাফুল মখলুকাত। নিজের অসীম শক্তি ও সম্ভাবনাকে বুঝতে পারে। লোভ-লালসা, ভয়-ভীতি, কাপুরুষতা ও প্রবৃত্তির শৃঙ্খল যে অনন্য মানবসত্তাকে বন্দি করে রেখেছে, তা থেকে নিজেকে মুক্ত করার শক্তি তার মধ্যে জন্ম নেয়। সে মুক্তি পায় প্রাত্যহিক জীবনের ক্লান্তিকর একঘেয়েমি থেকে। মুক্ত বিশ্বাস প্রতিটি কাজে চিত্তকে করে একাত্ম। আর কাজের সাথে একাত্ম হতে পারলে প্রতিটি কাজ হয়ে ওঠে আনন্দের উৎস।

দৈনন্দিন জীবন বেশিরভাগ চিন্তাশীল মানুষের জন্যেই যুগে যুগে ছিল এক ক্লান্তিকর বিড়ম্বনা। এ ক্লান্তিকর বিড়ম্বনা থেকে মুক্তির পথ সচেতন মানুষ সবসময়ই খুঁজেছে। এক শিষ্য গুরুর কাছে বললেন, এই ভাত খাওয়া, গোসল করা, কাপড় পরা, সংসার করা, প্রার্থনা করা-এই একঘেয়েমি থেকে মুক্তি চাই।

গুরু বললেন, ভাত খাও, গোসল কর, কাপড় পর, সংসার কর, প্রার্থনা কর।
কিছুদিন পর শিষ্য আবার আর্তি জানালেন।
গুরুরও সেই একই জবাব। একই নির্দেশ।

গুরুবাণীর মর্মার্থ উপলব্ধি করতে শিষ্যের লেগেছিল একযুগ। একযুগ পরে তিনি বুঝেছিলেন, যান্ত্রিকতার স্বয়ংচালিত ক্রিয়ার মতো কাজ করে যাওয়ার ফলেই প্রাত্যহিক কাজে একঘেয়েমি চলে আসে। বেশিরভাগ সময়ই মন অতীতে বা ভবিষ্যতে বিচরণ করে বলেই আমরা বর্তমানকে পুরোপুরি উপভোগ করতে ব্যর্থ হই। বর্তমান হয়ে ওঠে একঘেয়ে। দিনের প্রতিটি কাজের সাথে চিত্তকে একাত্ম করতে পারলে, প্রতিটি কাজের মাঝে আত্মনিমগ্ন হতে পারলে, মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পারলেই যান্ত্রিকতার একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। প্রতিটি কাজই হয়ে ওঠে আনন্দের উৎস। তখন প্রতিদিনের প্রতি লোকমা আহার, প্রতিবারের গোসল, প্রত্যেক কাপড়, স্ত্রীর সাথে আলাপন, দৈনন্দিন কর্তব্য ও দায়িত্ব- অর্থাৎ প্রতিটি কাজই মনে হবে এ এক নতুন জগৎ, এ এক নতুন জীবন, এ এক নতুন আনন্দলোক। তখন প্রতিবারের প্রার্থনাতেই আপনি পুলকিত হবেন, চমকিত হবেন, স্রষ্টাকে উপলব্ধি করবেন নিত্য নব মহিমায়। প্রতিটি চাওয়া পরিণত হবে পাওয়ায়। প্রতিটি সেজদা পরিণত হবে মেরাজে।

ভ্রান্ত ধারণা ও সংস্কারের শৃঙ্খল মুক্তির পথ হচ্ছে মেডিটেশন। দৈনন্দিন কাজের একঘেয়েমিকে নতুন আনন্দলোকে রূপান্তরিত করার পথও মেডিটেশন। কারণ মেডিটেশন আপনার মনকে বর্তমানে নিয়ে আসে। মেডিটেশন অতীতের ব্যর্থতার গ্লানি আর ভবিষ্যতের আশঙ্কা থেকে মনকে মুক্ত করে। বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্তে

সংযোজন করে নব নব মহিমা। প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি বিষয়ের অন্তর্লোকে মনকে প্রবেশ করায়। আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ সচরাচর বিষয়কেও নতুন পর্যবেক্ষণী আলোয় নতুন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর করে তোলে। মেডিটেশন আপনাকে আত্মনিমগ্ন করে। অন্তর্লোককে উদ্ভাসিত করে নতুন জ্ঞান আর উপলব্ধিতে। মেডিটেশনের মাধ্যমেই আপনি সংযোগ সাধন করতে পারেন আপনার 'অন্তরের আমি'র সাথে, আপনার শক্তির মূল উৎসের সাথে। এই আত্মশক্তির আবিষ্কার ও আত্ম অনুভব এমন এক মুক্ত বিশ্বাস-যা আপনাকে সকল শিকল থেকে মুক্ত করবে, দৈনন্দিন একঘেয়েমি রূপান্তরিত হবে আনন্দে।

মেডিটেশনের পথ ধরেই আপনি অতিক্রম করবেন আপনার জৈবিক অস্তিত্বের সীমাবদ্ধতা। আপনার উত্তরণ ঘটবে অনন্য মানুষে। আপনি পাবেন আপনার প্রথম ও পরিপূর্ণ স্বাধীনতা।

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

নতুন সহস্রাব্দের প্রয়োজনকে সামনে রেখে কোয়ান্টাম মেথড বইয়ের পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতে সক্ষম হওয়ায় আমরা পরম করুণাময়ের কাছে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশন কোর্সের একশত ক্লাসে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, হাজার হাজার কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটের অনুভূতি এবং অসংখ্য পাঠকের অজস্র প্রশ্নের প্রেক্ষিতে পুরো বইটিকে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে, নতুন অধ্যায় যোগ করা হয়েছে, পুরনো অধ্যায়গুলোকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি কোয়ান্টাম মেথডের বর্তমান সংস্করণ থেকে নতুন প্রজন্ম আরো সহজে আত্মনির্মাণের প্রক্রিয়া আয়ত্ত করে নিজের মেধা ও সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করতে পারবেন, তাদের জীবনে সাফল্য আসবে সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায়। কল্যাণ ও প্রশান্তিতে ভরে উঠুক সবার জীবন।

মহাজাতক

১ জানুয়ারি ২০০০ সাল

যাত্রা হোক শুরু

সবকিছুই পরিবর্তনশীল। আনন্দ-দুঃখ, হাসি-কান্না পার্থিব কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। আপনার আজকের সাফল্য বা ব্যর্থতা তা-ও স্থায়ী নয়। কারণ সময় এগিয়ে চলে। সময়ের সাথে সাথে সবকিছুই পরিবর্তিত হয়। তবে এ পরিবর্তন ভালোর দিকে যাবে, না মন্দের দিকে যাবে, তা নির্ভর করবে আপনার ওপর। কারণ আপনি যদি বর্তমানে সমস্যা ভারাক্রান্ত বা ব্যর্থ বা হতাশাগ্রস্ত হয়ে থাকেন, তাহলে তার কারণ হচ্ছে অতীতে আপনার মনের অবচেতনে প্রদত্ত ভুল প্রোগ্রামিং। এ প্রোগ্রামিং আপনার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যে-কোনোভাবেই হতে পারে। অবশ্য এজন্যে ভেঙে পড়ার কিছু নেই। দার্শনিক কনফুসিয়াস খুব চমৎকারভাবে বলেছেন, 'ব্যর্থতার মাঝেই সুপ্ত থাকে সাফল্যের বীজ'। আপনি সাফল্যের এই বীজকে লালন করুন। মনের অবচেতনের তথ্যভাণ্ডারকে পুনর্বিন্যস্ত করুন। মন আলাদিনের জাদুর চেরাগের মতোই আপনাকে সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে নিয়ে যাবে।

শুধু সাফল্যের পথে নয়, যে-কোনো পথেই যাত্রা শুরু হয় একটি ছোট পদক্ষেপের মাধ্যমে। হাজার মাইল ভ্রমণের সূচনাও হয় প্রথম পা ফেলার মধ্য দিয়ে। এ বই হাতে নিয়ে আপনি সাফল্যের পথে প্রথম পা দিয়েছেন। আপনি মনোযোগ দিয়ে এক থেকে ২২ অধ্যায় পর্যন্ত একবার পড়ে যান। বইয়ের বাকি পাঁচটি অধ্যায় পড়বেন প্রথম ২১টি অধ্যায়ের অনুশীলনী রপ্ত হওয়ার পর। বইটিকে আপনি দুভাগে ভাগ করে নিতে পারেন। একভাগ হচ্ছে তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা আর অপর ভাগ হচ্ছে অনুশীলনী। তাত্ত্বিক আলোচনা অবশ্যই আপনাকে আনন্দ দেবে। কিন্তু অনুশীলনীগুলো দেবে প্রত্যক্ষ ফল। তাই আলোচনা পড়ার চেয়ে, আলোচনা বোঝার চেয়ে অনুশীলনীর একাগ্র অনুশীলন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারো কাছে আলোচনা একটু জটিল মনে হলে, বোঝার প্রচেষ্টা পরবর্তী সময়ের জন্যে রেখে দিয়ে বর্তমানে অনুশীলনীর অনুশীলনে মনঃপ্রাণ সঁপে দিন। ফলাফল একই হবে। একটি ছোট্ট উদাহরণ এক্ষেত্রে আপনাকে আশ্বস্ত করার জন্যে যথেষ্ট। যেমন বৈদ্যুতিক আলো। বাতি জ্বালিয়ে বৈদ্যুতিক আলো উপভোগের জন্যে বিদ্যুৎ কোন পাওয়ার হাউজে উৎপন্ন হচ্ছে, কোন ট্রান্সমিশন লাইন

আলোময় করে দেখতে পারেন, তেমনি যিনি এসব কিছুই জানেন না, শুধু সুইচ অন/ অফ করতে জানেন, তিনিও একইভাবে ঘর আলোকিত করতে পারেন। আলো অর্থাৎ ফল পাওয়ার জন্যে সুইচ অন/ অফ করতে জানা অর্থাৎ অনুশীলনীর অনুশীলনই যথেষ্ট।

প্রথম ২১ অধ্যায় একবার পড়ার পর আপনি ২২ নম্বর অধ্যায়ের নির্দেশাবলী ভালোভাবে পড়ুন। নির্দেশাবলী অনুধাবন করুন এবং তা অনুসরণ করতে সচেষ্ট হোন। শুরু করুন শিথিলায়ন চর্চা। নিয়মিত চর্চা অব্যাহত রাখুন। শিথিলায়ন পুরোপুরি আয়ত্ত হলেই আপনি মনের শক্তি বলয় নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি হাতে পাবেন। এ চাবিকাঠির অপর নাম হচ্ছে মনের ধ্যানাবস্থা। ধ্যানাবস্থায় মন হয় ত্রিকালদর্শী, চেতনা অতিক্রম করে সকল বস্তুগত সীমা। মনের এই ধ্যানাবস্থার শক্তিকে প্রয়োগ করেই প্রাচ্যের সাধক-দরবেশ-ঋষিরা একদিন আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। ইচ্ছা করেছেন-ঘটনা ঘটেছে। ইচ্ছা করেছেন-মানুষ রোগমুক্ত হয়েছে। ইচ্ছা করেছেন-বিপদ কেটে গেছে। ইচ্ছা করেছেন-সুযোগ এসেছে, সাফল্য এসেছে। আপনিও এই চাবিকাঠিকে কাজে লাগিয়ে সকল স্ব-আরোপিত সীমাবদ্ধতা ও স্বসৃষ্ট ব্যর্থতাকে (আপনার সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতা মূলত স্ব-আরোপিত ও স্বসৃষ্ট) নিজেই অতিক্রম করবেন। ধাপে ধাপে একের পর এক অনুশীলনী অনুশীলন করে প্রো-অ্যাকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যাবেন বৈষয়িক সাফল্যের পথে, সুস্বাস্থ্য ও রোগমুক্ত জীবনের পথে, আত্মোপলব্ধির পথে। অর্জন করবেন অতিচেতনা। নিজের ব্রেনের ডান ও বাম বলয়কে বেশি পরিমাণে এবং সমন্বিতভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। অচেতন ও অবচেতনের সাথে স্বতঃস্ফূর্ত যোগাযোগের মাধ্যমে লাভ করবেন প্রজ্ঞা। এই চাবিকাঠি দিয়েই দৃশ্যমান সবকিছুর পেছনে প্রকৃতির যে নেপথ্য স্পন্দন ও নিয়ম কাজ করছে তার সবটাকেই আপনি নিজের ও মানবতার কল্যাণে সক্রিয় করে তুলতে পারবেন।

এবার তাহলে সাফল্যের পথে, আত্ম অনুভবের পথে, মহামানবে উত্তরণের পথে আপনার যাত্রা শুরু করুন। ধাপে ধাপে পায়ে পায়ে এগিয়ে যান মহিমান্বিত জীবনের পথে।

নতুন বিশ্বদৃষ্টি

কোয়ান্টাম ফিজিক্স, নিউরো-সায়েন্স এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ শতকে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের বিশ্বদৃষ্টিকেই পাল্টে দিয়েছে। যে বিজ্ঞান ছিল দীর্ঘদিন বস্তু কেন্দ্রিক, নিউটনিয়ান মেকানিক্সের নিগড়ে বন্দি, সে বিজ্ঞানই এখন হয়ে পড়েছে চেতনা নির্ভর। পাশ্চাত্যের পদার্থবিজ্ঞানের সর্বাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এখন এসে একাত্ম হয়েছে প্রাচ্যের সাধকদের বিশ্বদৃষ্টির সাথে, মনকেন্দ্রিক বিশ্বদর্শনের সাথে।

বিজ্ঞানী নিউটন এবং ম্যাক্সওয়েলের সূত্র অনুসরণ করে পদার্থবিজ্ঞান ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এক সুশৃঙ্খল বিশ্বদৃষ্টি উপস্থাপন করে। এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সবকিছুই এক নিয়মের অধীন, সেখানে বিজ্ঞানীর কোনো ভূমিকা নেই। বিজ্ঞানী সেখানে একজন দর্শক মাত্র। আর পুরো প্রক্রিয়া হচ্ছে দর্শক-মন নিরপেক্ষ। এই বিশ্বদৃষ্টিতে প্রথম ফাটল ধরান বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে তার বিখ্যাত 'থিউরি অব রিলেটিভিটি' উপস্থাপন করে। এই নতুন তত্ত্বের মাধ্যমে বস্তুগত বাস্তবতা প্রতিষ্ঠায় দর্শকের আগমন ঘটে। বস্তুগত প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণকারী বিজ্ঞানীও এই প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণকারীতে পরিণত হন।

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের উদ্ভব ঘটার সাথে সাথে দর্শকের ভূমিকা বস্তুগত ঘটনা বা মতবাদের ক্ষেত্রে আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বস্তুগত মতবাদ কাঠামোয় বা যে-কোনো বিষয় ব্যাখ্যায় দর্শকের মন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। বৈজ্ঞানিক চিন্তায় এই আমূল পরিবর্তন কোয়ান্টাম পদার্থ বিজ্ঞানীদের বিস্ময়াবিষ্ট করে তোলে এবং তারা মানব-মন ও দর্শন সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়নে নিমগ্ন হন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে কোনো যুগেই নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানীরা এত বিপুল সংখ্যায় তাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলের দার্শনিক ও মানবিক মূল্যায়ন করে নিবন্ধ বা পুস্তক রচনা করেন নি।

কোয়ান্টাম ফিজিক্সের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ওয়ার্নার হেইজেনবার্গ তার 'Philosophical Problems of Quantum Physics'-এ লেখেন যে, প্রকৃতির নিয়ম সংক্রান্ত গবেষণা এখন আর শুধু মৌল কণাসমূহ নিয়ে আলোচনা করে না। এখন তা আলোচনা করে এই কণাসমূহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নিয়ে অর্থাৎ আমাদের মনের বিষয়বস্তু নিয়ে। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মূল সমীকরণ প্রস্তুতকারী বিজ্ঞানী এরউইন শ্রডিঙ্গার ১৯৫৮ সালে 'Mind and Matter' নামে এক অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বিজ্ঞানের এই নতুন তত্ত্বের আলোকে দার্শনিক অলডাস হাক্সলির আত্মিক বিশ্বদর্শনের সাথে নিজেকে একাত্ম করেন। কোয়ান্টাম বিজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রডিঙ্গারই প্রথম প্রাচ্যের দার্শনিক চিন্তাধারার সাথে

সমমর্মিতা প্রকাশ করেন। এরপর থেকে আধুনিক বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে পাশ্চাত্যে দুটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ হচ্ছে, ফ্রিটজফ কাপরা-এর 'The Tao of Physics' এবং গ্যারি জুকাভ-এর 'The Dancing Wu Li Masters'.

ডারউইনের পর থেকে মানবীয় আচরণকে একটা জৈবিক প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করার প্রচুর চেষ্টা করা হয়েছে। আবার জৈবিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে শুধুমাত্র শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম হিসেবে। এদের বক্তব্যকে কার্ল সেগান 'The Dragons of Eden'-এ চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন, 'আমরা যাকে কখনো কখনো মন বলি তা হচ্ছে ব্রেন। আর এই ব্রেনের কার্যক্রম এর অঙ্গ ও শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রমের ফলাফল ছাড়া কিছুই নয়। এখানে মন বলে কিছু নেই।' আর মলিকুলার বায়োলজিস্ট ফ্রান্সিস ক্রিক তার বই 'Of Molecules and Men'-এ লিখেছেন, 'সকল প্রাণিবিদ্যাকে অবশ্যই পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন দিয়েই ব্যাখ্যা করতে হবে।'

জীবন, প্রাণ, মনকে যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, মন থেকে শুরু করে আবার মনেই ফিরে আসতে হয়। যেমন প্রথমত ধরুন, চিন্তা ও চেতনাসহ মানব-মনকে কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমের তৎপরতা হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যাকে আবার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, সকল স্তরের জৈবিক কর্মকাণ্ড পরমাণু বিজ্ঞানের আলোকে পুরোপুরি বোঝা যেতে পারে। কারণ প্রতিটি জৈবিক কার্যক্রম কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদির পরমাণুর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আলোকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সর্বশেষে, পরমাণু বিজ্ঞানকে পুরোপুরি বুঝতে হলে কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর মাধ্যমে বুঝতে হবে। আর কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর সাথে মন হচ্ছে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দর্শক মনের ভিত্তি ছাড়া কোয়ান্টাম প্রক্রিয়াই হচ্ছে অসম্পূর্ণ।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. সৈয়দ সফিউল্লাহ তার 'অস্তিত্বের অতলান্তে' গ্রন্থে কোয়ান্টাম সূত্র প্রসঙ্গে সাব-এটমিক পার্টিকেলের স্পিন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'পারমাণবিক কিংবা অব-পারমাণবিক পর্যায় অবশ্য চক্ষুষ্মান জগতের স্পিনের সাথে তুলনা করলে বিপাকে পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। বিশেষ করে নিজ অক্ষের চারপাশে আবর্তনের কথা উঠলেই দিক-নির্দেশনার কথা ওঠে। মনে আসে একটা রেফারেন্স অক্ষের। ইলেক্ট্রন স্পিনের দিক নির্ণয়ের জন্যে বিদ্যুৎ কিংবা চুম্বকীয় ফিল্ডকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই, রেফারেন্স ফিল্ডকে যেদিকেই

বসাই না কেন ইলেক্ট্রন স্পিন ঠিক ঠিক রেফারেন্স ফিল্ডের সাথে অ্যালাইন্ড হবে অর্থাৎ পাশাপাশি অবস্থান করবে। ব্যাপারটা যেন খানিকটা এমন যে, ইলেক্ট্রন যেন আগে থেকেই বুঝতে পারছে নিরীক্ষণকারী কীভাবে তার নিয়ম তৈরি করতে যাচ্ছেন। আরেকভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, নিরীক্ষণকারীর মনই ঠিক করছে নিরীক্ষণের ফলাফল কী হবে। এক্ষেত্রে জড়বস্তুর ওপর মানব-মনের কর্তৃত্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ তো গেল স্পিন সম্পর্কে বিশ্বজনীন অনিশ্চয়তার একটা গুরুত্বপূর্ণ গভীর দিক। আরেকদিকে দেখা যায় সাব-পারমাণবিক জগতে স্পিন একটি ধ্রুব বাস্তবতা। এই স্পিনের কারণেই পরমাণুদের মৌলগত ভিত্তিতে এত সমাহার, রাসায়নিক বন্ধনের অন্যতম উৎসের উদ্বোধন এবং তার থেকে জীবনের উৎসব।'

মনের বস্তুকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা সম্পর্কে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নিউরোসায়েন্টিস্ট স্যার জন একলস-এর বক্তব্যও এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। নিউরোসায়েন্স বিকশিত হয়েছে গত ৩০ বছরে। গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য মানব মস্তিষ্ক বা ব্রেন। ব্রেনের কার্যক্রম সম্পর্কে বিজ্ঞান অনেক কিছুই জেনেছে। তারপরও ব্রেন সম্পর্কিত জ্ঞান এখনো রয়েছে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে। বিজ্ঞানী একলস প্যারাসাইকোলজিস্টদের সম্মেলনে মন বস্তুকে প্রভাবিত করতে পারে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'আমরা যখন চিন্তা করি, তখন প্রতিটি চিন্তার সাথে সাথে ব্রেন নিউরোনে অবস্থিত কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণু স্থান পরিবর্তন করে। কার্বন, হাইড্রোজেন ইত্যাদির পরমাণু হচ্ছে বস্তু আর চিন্তা হচ্ছে বস্তুর অস্তিত্ব বিবর্জিত।'

বিশ্বদৃষ্টি পরিবর্তনে বিজ্ঞানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। এই বিজ্ঞানের মূলকথা হচ্ছে, জীবকোষের মূলকেন্দ্র ডিএনএ-আরএনএ। সেখানে সংরক্ষিত তথ্যভাণ্ডার দ্বারাই সকল প্রাণ বিকশিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। আর এই তথ্যভাণ্ডারে পরিবর্তন আনয়ন করে প্রাণের বিকাশকে প্রভাবিত করা যায়। এই বাস্তবতা বস্তুর ওপর চেতনা ও তথ্যের কর্তৃত্বকেই নতুন সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করে।

মন ও চেতনার ক্ষমতা সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির সার-সংক্ষেপ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ইউজিন উইগনার তার 'Remarks on the Mind-Body Question' নিবন্ধে চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, অধিকাংশ পদার্থ বিজ্ঞানীই এই সত্যকে মেনে নিয়েছেন যে, চিন্তা অর্থাৎ মনই হচ্ছে মূল। 'চেতনার উল্লেখ ছাড়া কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর নিয়মকে পুরোপুরি

সঙ্গতিপূর্ণভাবে গঠন করা সম্ভব নয়।' (It is not possible to formulate the laws of Quantum mechanics in a fully consistent way without reference to the consciousness.) নিবন্ধের উপসংহারে বিজ্ঞানী উইগনার বলেছেন, 'বিশ্বের বৈজ্ঞানিক গবেষণা শেষ পর্যন্ত চেতনাকে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।' (Scientific study of the world led to the content of consciousness as an ultimate reality.) আর এভাবেই আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ এসে একাত্ম হয়েছে প্রাচ্যের প্রাচীন সাধকদের মনকেন্দ্রিক বিশ্বদর্শনের সাথে। আর আধুনিক মানুষ নতুনভাবে ব্রতী হয়েছে চেতনার শক্তিকে, মনের অসীম ক্ষমতাকে মানবতার কল্যাণে ব্যবহারের। কোয়ান্টাম মেথড মনের এই অসীম শক্তিকে ব্যবহারের সবচেয়ে সহজ ও ফলপ্রসূ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।